স্মরনিকা

ত্রয়োদশ দ্বি-বার্ষিক উত্তর পূর্ব ভারত হিন্দু মিলন মন্দির সম্মেলন

১৪, ১৫, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১২

ভুবরীঘাট হিন্দু মিলন মন্দির

ভুবরীঘাট ঃ করিমগঞ্জ ঃ আসাম

এখনও সময় আছে

ড° পরিমল কুমার দত্ত

তন্ময় হয়ে ভাষণ শুনছেন সবাই। বক্তা হচ্ছেন হিন্দী সাহিত্যের দিগ্‌গজ পণ্ডিত মাননীয় শ্রীউপাধ্যায়জী। বিশ্ব হিন্দী সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষ্যে বহুবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন এই পি.এইচ্‌.ডি., ডি.লিট্‌ উপাধিধারী বাগ্মীপ্রবর উপ্যাধ্যায়জী। ভারতের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে (A+) "ভারতীয় সাহিত্য মেঁ নারী" শীর্ষক আলোচনাচক্রে উপস্থিত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সামনে বলে চলেছেন যুগে যুগে নারীদের মর্যাদার হ্রাস-বৃদ্ধি কিভাবে ভারতীয় সাহিত্যে ঘটেছে। হঠাৎ যেন ছন্দপতন হল। সভাকক্ষে মৃদুগুঞ্জন "তান্ত্রিক সাহিত্যের জন্যেই ভারতীয় নারীদের অধঃপতন ঘটেছে। তান্ত্রিক সংস্কৃতিই নারীদের মর্য্যাদা ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় নারী গৌরবময় শিখরসে নীচে গিরা। উসকা জিম্মেদার হ্যায় তন্ত্র।" পর পর তিনবার বললেন এই কথাগুলো বেশ জোর দিয়ে। লক্ষ্য করলাম যে অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা একজন আরেকজনের সাথে নীচুস্বরে কথা বলছেন আর আমার দিকে তাকাচ্ছেন। মঞ্চে উপবিষ্টা সঞ্চালিকাও আমার দিকেজিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এই কথাগুলো শুনে আমিও বিস্মিত। গতকালই এখানে এই সভাকক্ষের মঞ্চ থেকে Women in Tantra -এর উপরে আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছি। একের পর এক প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল আলোচনাপর্ব। আমার বক্তব্যের বিপরীত কথা বলছেন উপাধ্যায়জী। এজন্য সবাই অবাক। ভাষণের শেষে মঞ্চে গিয়ে বিনীতভাবে প্রশ্ন করলাম, 'পণ্ডিতজী, আপনি যে কোনো একটা তন্ত্রের নাম বলুন তো যার মধ্যে নারীজাতিকে হেয় করা হয়েছে বা যার জন্য ভারতীয় নারীজাতির অধঃপতন শুরু হয়েছিল?" হিন্দী সাহিত্যিক হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর লেখা কোনো এক উপন্যাসে নাকি দ্বিবেদী মশাই একরকম মন্তব্য করেছেন বলে জানালেন উপাধ্যায়জী "কোনো প্রাসংগিক গ্রন্থের নাম নয় (reference book) তন্ত্রের নাম (original Tantra work) বলুন।" আমি প্রশ্নটা মনে করিয়ে দিলাম। সবাই কৌতুহলী। তাকিয়ে আছেন পণ্ডিতজীর দিকে। "হাজারী প্রসাদ দ্বিদেবী তাঁর উপন্যাসের এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন গোপীনাথ কবিরাজের তান্ত্রিক সাহিত্য থেকে" একটু রুক্ষস্বরে বললেন। "তন্ত্রের নাম বলুন। মহামহোপ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের কোন গ্রন্থে নারীর মর্যাদাহানির প্রধান কারণ তান্ত্রিক সংস্কৃতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে? সেই গ্রন্থের নামটা দয়া করে বলুন।" আবার বললাম। বেশ কয়েকজন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং সঞ্চালিকা মহোদয়াও তাঁকে মূল তন্ত্র গ্রন্থের নাম ও গোপীনাথ কবিরাজের গ্রন্থের নাম বলতে অনুরোধ করলেন। "আমি জানি না। ম্যাঁয় নে তন্ত্র গ্রন্থ ঔর গোপীনাথজী কা কিসী কিতাব নহী পঢ়া। ম্যাঁয় নে স্রেফ্‌ হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীজী কা কিসী কিতাব মেঁ ইস প্রকার কোই মন্তব্য পঢ়া থা।" পণ্ডিতজী একথা বলেই চুপ করলেন।

আরেকটা ঘটনার উল্লেখ করছি—

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের কৃতী ছাত্র মাননীয় নন্দজী ভাগবত পাঠক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরাতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ, সুন্দর বাচনভংগী, অপূর্ব বিশ্লেষণশক্তি, মধুর কণ্ঠস্বর এবং সুদর্শন চেহারা। জনপ্রিয় ভাগবত পাঠকের সব কয়টি গুণই তাঁর মধ্যে আছে। একদিন ঘটনাচক্রে আলাপ হ'ল। কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলেন যে আমি তন্ত্রশাস্ত্রের উপরে গবেষণা করছি। (আমার লেখা বই Tantra - its relevance to modern times আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে ও পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট আদৃত হয়েছে।) "ও"! তাহলে তো আপনি একজন তান্ত্রিক। আপনি তো আমাকে অচল করে দিতে পারেন।" এই পরম কৃষ্ণভক্তের মুখে এহেন মন্তব্য শুনে আমি তো হতবাক। "না না আমি তান্ত্রিক হতে পারিনি। আমি একজন তন্ত্র গবেষক ও পাঠক।" উত্তর দিলাম।

পরের ঘটনায় আসছি—

উত্তর পূর্ব ভারতের এক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শ্রীযুত গোস্বামীদেব জানতে পেরেছেন যে আমি তন্ত্রশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করছি। কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎই মন্তব্য করলেন, "তন্ত্রশাস্ত্রকে আমি একদম পছন্দ করিনা। এই মদ, মাংস, মেয়েছেলে নিয়ে কি ধর্মীয় সাধনা হয়? তাছাড়া বলি প্রথাটা কি বীভৎস! কামাখ্যায় কেন বলি দেওয়া হয়? বলি দিলেই কী দেবী সন্তুষ্ট হন?

অন্য ঘটনার উল্লেখ করছি—

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইস্‌কনের মায়াপুরের মন্দিরে উপস্থিত হয়েছি 'রাধাতন্ত্র' নামে একটি বৈষ্ণবীয় তন্ত্রের সন্ধানে। কলকাতার 'নবভারত পাবলিশার্স' পরে এই বইটা প্রকাশ করলেও তখন পর্যন্ত বইটা দুষ্প্রাপ্যই ছিল। দায়িত্বে থাকা পরম বৈষ্ণব সাধকটি তো আমার মুখ থেকে "রাধাতন্ত্র" শব্দটা শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। "রাধার' সাথে "তন্ত্র" শব্দের সংযোগই তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে।

এরকম অনেক ঘটনার উদাহরণ আছে, "এখনও সময় আছে" এই শীর্ষক আলোচনায় আমি মাত্র কয়েকটা উদাহরণ দিয়েছি। আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা এখনও মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় পরিচালিত হয়ে হিন্দু সমাজকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিচ্ছি সেটা বোঝানো।

মধ্য যুগে আমরা শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-সৌর গানপত্যর পারস্পরিক মতবাদের বিরুদ্ধে কটু মন্তব্য করেছি ও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলিতে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছি। শাক্ত-শৈবদের হাতে কৃষ্ণ মহিমা বিকৃত হয়েছে, বৈষ্ণব ভক্তদের হাতে শিব-কালীর বিকৃত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এই আসামেই ঘটেছিল শাক্ত-বৈষ্ণবের সংঘর্ষ। নববৈষ্ণব বাদের সমর্থক ও "এক শরণ ধর্মে"র প্রবর্ত্তক শঙ্করদেব শেষ পর্যন্ত শেষ বয়সটা কোচবিহারে কাটিয়েছিলেন। ইতিহাস বিখ্যাত মোয়ামরীয়া বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল এই শাক্ত বৈষ্ণবদের তিক্ত সম্পর্ক।

এখনও বহু বৈষ্ণব ভক্ত নিজের বাড়ীর পোষা কুকুরের নাম রাখেন 'ভুলু' অর্থাৎ 'ভোলানাথ' বা 'শিব'। শিবকে হেয় করার কি বিকৃত প্রয়াস। শৈব বা শাক্তরাও অনেকে এব্যাপারে পিছিয়ে নেই। তাঁরাও তাদের বাড়ীর পোষা কুকুরের নাম রাখেন 'কালু' অর্থাৎ 'কালাচাঁদ' বা 'কৃষ্ণ'। সেই মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের যুগেও আমরা বহন করে চলেছি।' এখনও আমরা হিন্দু সমাজের অবক্ষয়ের কারণ আলোচনা করতে গিয়ে সরাসরি ব্রহ্মণদের আক্রমণ করি। বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথার কুফল থাকলেও তার জন্য শুধু ব্রাহ্মণদের দোষ দিলে তো হবে না। হিন্দুধর্ম ও আর্য সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণদের অবদান অপরিসীম। ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে ভারতের তীর্থস্থান ও শক্তিপীঠগুলো, যেগুলোর অস্তিত্ব রক্ষায় হাজার হাজার ব্রাহ্মণ শত শত বৎসর ধরে অশেষ কষ্ট সহ্য করেছেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্রাহ্মণদের জাতি বা বর্ণের নামে আতিশয্যকে সামনে রেখে সমস্ত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে দায়ী করলে তো চলবে না। আসলে আমরা বিধর্মী ও বিদেশীদের অনবরত অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ধূর্ত গোয়েবলস্‌ এর প্রচারের মত গ্রাম গ্রামান্তরে গিয়ে বহু পীর ও সুফী সাধকরা দিনের পর দিন জাতিভেদ প্রথা ও ব্রাহ্মণদের ভূমিকা সম্পর্কে কুৎসা রটিয়ে ধর্মান্তরিত করেছে লক্ষ্য লক্ষ্য হিন্দুকে। ব্রাহ্মণরা যদি শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করেই থাকেন তাহলে অব্রাহ্মণরা সংস্কৃত ভাষা শিখে সেই শাস্ত্রগুলোর মর্ম উদ্ধার কেন করেন না?

হিন্দুধর্মে অনেক ধর্মগুরু এসেছেন, নিজের নিজের সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছেন, শিষ্যের সংখ্যা বাড়িয়েছেন এবং ভারতবর্ষ তথা বিদেশের বিভিন্ন স্থানে সংগঠন স্থাপন করে অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছেন। তাঁরা সবাই প্রণম্য। তাঁরা সবাই নমস্য। কিন্তু তাঁদের ভক্ত ও অনুরাগীরা অন্য ধর্মগুরু ও মতবাদের প্রকাশ্য সমালোচনা করে হিন্দু সমাজের ভিত্তিকে দুর্বল করে চলেছেন। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানতো শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অন্য গুরুর দীক্ষিত শিষ্যদের দলে টেনে এনে নিজেদের ইষ্ট গুরুর দীক্ষা দেওয়ার প্রতিযোগিতায় উঠে পড়ে লেগেছেন।

বিশাল হিন্দু সমাজ অনেক দেবতার পুজো করে। অনেকেই আবার শুধু নিজের ইষ্ট দেবতার প্রসাদ ছাড়া অন্য দেবতার প্রসাদ খান না। 'বলিদান' সম্পর্কে অনেকে শিক্ষিত লোকেই তীব্র ভাষায় নিন্দাসূচক মন্তব্য করে থাকেন। সেই শিক্ষিত লোকেরাই ঈদের কুরবানী সম্পর্কে নীরব থাকেন। সারা বছরে বলিদানের মাধ্যমে কতগুলো প্রাণী হত্যা করা

হয়? আর কুরবানীতে কয়টা প্রাণী নিহত হয়? এর সঠিক হিসেবটা কেউ জানেন কী?

লাল রং এর ফুল সম্পর্কে আমাদের বিরাট ভয় ও আতংক। এই লাল ফুল এই ঠাকুরকে দেওয়া যাবে না, ঐ ঠাকুরকে দেওয়া যাবে না। অথচ প্রত্যেক ঠাকুর দেবতাই এক একজন মহাক্ষত্রিয় মহাযোদ্ধা।

একদিন আমিষ-নিরামিষ আহার নিয়ে আমরা হিন্দুরা অনেক তর্ক-বিতর্ক করে ছিলাম। আজও সেই ধারা বয়ে চলেছে। অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিতদের হিন্দু আমিষাহারীদের সম্পর্কে বিভিন্ন অশোভনীয় মন্তব্য প্রকাশ করতে দেখেছি ও শুনেছি। কিন্তু এই অহিংসার পূজারী পণ্ডিতরা জানেন কি যে একদিন বৈষ্ণবরা ও বলিদানের সমর্থক ছিলেন? তাঁরা শাক্তদের মত বলি দিতেন। দলে দলে বৌদ্ধ ধর্মে আকৃষ্ট জনসাধারণকে হিন্দু ধর্মে নিয়ে আসার জন্য একটা সমঝোতায় আসতে হয়েছিল এবং হিংসার প্রতীক (বৌদ্ধদের মতে) বলি প্রথাকে বৈষ্ণবরা পরিত্যাগ করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস তার সাক্ষী।

ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত একজন অবতারের শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন ইতিমধ্যে হজরত মহম্মদকে কুরেশী ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত হিসেবে প্রচার করে তাঁকে সমগ্রোত্রীয় করে তুলেছেন। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে তাঁদের ইষ্ট অবতার তো আর অবতার থাকবেন না যদি হজরত মহম্মদকে শেষ পয়গম্বররূপে গণ্য করা হয়— ইসলামধর্ম মতে হজরত মহম্মদই শেষ পয়গম্বর। সুতরাং সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবির্ভূত অবতার পুরুষের অবতারত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ গীতাই সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ধর্মগ্রন্থ এব্যাপারে কারুর কোনো সন্দেহ নেই যদিও 'গীতা' মহাকাব্য মহাভারতেরই অংশ। গীতার মর্মার্থ না বুঝে মহাক্ষত্রিয় তন্ত্রসাধক শ্রীকৃষ্ণকে 'রাসলীলা'য় আবদ্ধ করার জন্য ভাগবত পাঠকদের অনেকেই বিশেষভাবে ব্রতী। অন্য ধর্মের লোকেরা এই রাসলীলাকে বিকৃতভাবে পরিবেশন করে তাদের পয়গম্বরদের উৎকর্ষতার প্রচার করে। মহাভারতের মহাক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে শুধুমাত্র অষ্টকালীনের 'রাসলীলা'য় প্রক্ষেপ করার পরিণামটা কি ভয়াবহ তাতো সংকীর্ণ মনা ভাগবত পাঠকদের জানা নেই।

"এখনও সময় আছে" লিখতে গিয়ে আমাদের দুর্বলতা গুলো একের পর এক নজরে পড়ছে। আমরা যতই শিক্ষিত হচ্ছি ততই দীক্ষিত অদীক্ষিত, আমিষাশী নিরামিশষী ইত্যাদি দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছি। এর সমাধান কোথায়? এটা জানার চেষ্টা কেউ করছি না। আমাদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার ফলে আমরা ধীরে ধীরে নিরীহ জীবে পরিণত হচ্ছি। ঘর থেকে আমাদের নারীদের উঠিয়ে নিয়ে গেলেও সেই দুর্বৃত্তদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি নিয়ে চলি। তাকে আর উদ্ধার করার শক্তি ও সাহস আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আঘাত এলে সহ্য ক্ষমতা বাড়িয়ে দিচ্ছি, প্রত্যাঘাত করার হিম্মত নেই। অথচ ঘুমন্ত আত্মবিশ্বাসহীন হিন্দু জাতির কানে কানে যিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন, যিনি আমিষ-নিরামিষের দ্বন্দ্বের আগেই সমাধান করেছেন, পারস্পরিক বিদ্বেষে ক্ষত-বিক্ষত হিন্দু সমাজকে যিনি অমৃতের সন্ধান দিয়েছেন, যিনি ছিন্নি বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজকে একত্রিত করার শক্তিশালী বীজমন্ত্র দিয়েছেন, যিনি হিন্দু-মিলন মন্দির আন্দোলনের স্রষ্টা। সেই শিবাবতার যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী, যিনি শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব-সৌর-গাণপত্যর একমাত্র সমন্বিত রূপ — আমাদের একমাত্র শরণ্য। এই বিশাল হিন্দু সমাজের সামগ্রিক রূপের কথা স্বামী প্রণবানন্দজী ছাড়া কেই আগে ভাবেন নি। ঠাকুর শুধু ভাবেন নি, তিনি হাজার অন্ত্যজদের মধ্যে ছুটে গিয়ে বিপদে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছেন, তাঁদের আত্মমর্যাদা দিয়েছেন। ঠাকুরের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেই ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিভিন্ন শাখাগুলোতে এবং প্রধান কার্যালয়ে শিবচর্তুদশী, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, অন্নকুট উৎসব, ত্রিশূল উৎসব ইত্যাদি হিন্দু সমাজের সমস্ত সম্প্রদায়ের উৎসবগুলো পালিত হচ্ছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিভিন্ন আশ্রমগুলোতে বিভিন্ন জায়গার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা দেবের প্রতিমা অধিষ্ঠিত আছে। কোনো দেব/দেবীর কোনো অবতার পুরুষ/ইষ্ট গুরুর অমর্যাদা করা হয় না।

এখনও সময় আছে। স্বামী প্রণবানন্দজীর প্রদর্শিত আদর্শ ও পথেই আমাদের বিশাল হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও সংবর্ধন নিহিত আছে। আসুন, সম্প্রদায় নির্বিশেষে স্বামী প্রণবানন্দজীর স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে আসি আমাদের সবার স্বার্থে। আর দেরী নয়। এখনও সময় আছে।

স্বামী প্রণবানন্দ আচরণ সিদ্ধ যুগাবতার

শ্রী বেণু মাধব রায়

বুদ্ধ, শংকর চৈতন্যের ন্যায় যুগপুরুষ আচার্য্য ভাগবত পুরুষ। ঐ দিব্য শরীরে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য পূর্ণরূপে বিরাজিত। তদীয় করুণা ও ঔদার্য্য সমুদ্রের মতই বিশাল। তিনিই শিব-কৃষ্ণ-কালী-দুর্গাদিদেবতার সমন্বিত বিগ্রহরূপে অধিষ্ঠিত। অনন্ত ভাবের অফুরন্ত বারিধি তিনি। তিনি সন্ন্যাসী শিরোমণি। আবার রাজাধিরাজ মহারাজ। মুক্তিকামীদের দেন মুক্তিপথের সন্ধান, ভুক্তিকামীদের দেন সংযত ভোগের উপদেশ ও সাধন। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি দেশ জাতি সমাজের দুঃখ, দৈন্য, নিপীড়ন ও সহস্রবিধ সমস্যা হতে দূরে নেই। ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তীর্থ সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, জনসেবা, অনুন্নত উন্নয়ন, সমাজ সংস্কার ও সমাজ সংগঠন আদি বহুবিধ কর্ম পরিকল্পনা স্থান পেয়েছে তদীয় অধ্যাত্ম মহাসঙ্ঘে।

"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" সন্ন্যাসের এই মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছেন তার ত্যাগী সন্তানগণকে। বুদ্ধের ত্যাগ, শংকরের বিবেক-বৈরাগ্য, চৈতন্যের প্রেমের উপদেশ যখন দেন তখন একথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে আচার্য্যরূপে তিনি নিজেই এসকল ভগবদ্ভাবের আচরণ সিদ্ধ যুগাবতার। বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত গুরুপরাম্পরা ক্রমে যে আধ্যাত্মধারা চলে আসছে তার শ্বাশত কল্যাণময় ভাব গুলি, গ্রহণ করেছেন তিনি, আর দেখাচ্ছেন ত্যাগ, সংযম, সত্য ব্রহ্মচর্য্যের সনাতন ও সার্বজনিক সাধনার পথ। সঙ্ঘে পান্তা খাওয়া ব্রত স্বরূপ। তার সঙ্ঘে চা নেই, চুরট নেই, মাছ নেই, মাংস নেই, নিমকি-খাজা-গজার জলযোগের রাজকীয় রস সম্ভার নেই। ব্যক্তিসুখের জন্য ভক্ত প্রদত্ত অর্থ পর্য্যন্ত ব্যয় সংকোচ পূর্বক সেই অর্থের দ্বারা দেশ ও সমাজের সেবা এটাই সঙ্ঘের নীতি।

অসহায় তীর্থ যাত্রীগণকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে ন্যায্য ব্যয়ে পিতৃ পুরুষের শ্রাদ্ধাধি ক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে গয়াতে সঙ্ঘের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তীর্থগুরু পাণ্ডাদের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে। তিনি বলতেন ভারতের সাম্প্রদায়িক মিলনের প্রকৃষ্ট উপায় হিন্দু সংগঠন। হিন্দুতে হিন্দুতে অচ্ছেদ্য মিলন হলে হিদু মুসলমান, খৃষ্টানে মিলন অবশ্যামভাবী।

অস্পৃশ্যতা, অনাচারনীয়তা রূপ মহাপাপই হিন্দুর ভিতরে ভেদ বৈষম্যের অন্যতম কারণ। সহস্র বৎসরের ভেদ বৈষম্য দুর করে ভারতের কোটি কোটি হিন্দুর ভেতর ধর্মীয় সামাজিক চেতনা আনায়নের জন্য তিনি তদীয় ভাগবতী দৃষ্টিতে যে অভ্রান্ত উপায়ের ঋজুপন্থা প্রদর্শন করেছেন তা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য পল্লীতে পল্লীতে গঠন করে গেছেন হিন্দু মিলন মন্দির ও রক্ষীদল।

এই হিন্দু মিলন মন্দির হবে সর্বশ্রেণীর হিন্দুর মিলন ক্ষেত্র, তীর্থক্ষেত্র, শক্তিকেন্দ্র, সববকম সমাস্যার সমাধান ক্ষেত্র। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতের প্রতিটি হিন্দু যদি নিজকে হিন্দুনামে পরিচয় দেয়, এবং স্বধর্ম ও স্বসমাজ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে এমন এক অখণ্ড জাতীয় মহাশক্তির অভ্যুদয় ঘটবে যার সম্মুখে ক্ষুদ্রতর শক্তিগুলির নিস্ফল আন্দোলন স্তব্ধ হতে বাধ্য।

স্বামী প্রণবানন্দকে ঠিক ঠিক ভাবে গ্রহণ করলে দেশ মাতৃকার দ্বিখণ্ডন হয়তো হত না এবং অগনিত হিন্দুকেও লাঞ্ছিত ও ভিটেছাড়া হয়ে শোচনীয় দশায় পড়তে হত না।

।। জয়তু প্রণবানন্দ।।